[redacted] : মৌলিক অধিকার [Fundamental Rights]

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায় (12 - 35) নং ধারায় মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার পশ্চাতে মার্কিন সংবিধানই মূল প্রেরণা (অধিকারের সনদ, Bill of Rights)। ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়কে "Magna Carta of India" বলা হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য।

মূল সংবিধানে 7টি মৌলিক অধিকার ছিল, কিন্তু বর্তমানে 6টি মৌলিক অধিকার আছে —

1. Right to Equality সাম্যের অধিকার (14–18) নং ধারা।
2. Right to Freedom স্বাধীনতার অধিকার (19–22) নং ধারা।
3. Right against exploitation শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (23 এবং 24) নং ধারা
4. Right to Freedom of religion (ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (25–28) নং ধারা।
5. Cultural and educational Rights (সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অধিকার) (29 ও 30) নং ধারা।
6. Right to Property (সম্পত্তির অধিকার) (31 নং ধারা) — 44 তম 1978 সং শোধনী আইনে সম্পত্তির অধিকার বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে এটি সাধারণ আইনগত অধিকার হিসাবে 300A ধারায় (সংবিধানের XII অধ্যায়) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
7. Right to constitutional remedies (সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (32—35) নং ধারা।

৪.৩ ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারসমূহ
Fundamental Rights guaranteed in the Constitution of India

মূল ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ১২-৩৫নং ধারাগুলিতে ৭ প্রকার মৌলিক অধিকারের উল্লেখ ছিল। যথা : (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার, (৬) সম্পত্তির অধিকার, (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় থেকে বাদ দিয়ে একটি সাধারণ অধিকারে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে ৬ প্রকার মৌলিক অধিকার রয়েছে।

৪.৪ ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত সাম্যের অধিকার
Right to Equality as guaranteed in the Constitution of India

যে সমস্ত আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'সাম্য'। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮ নং ধারাগুলিতে সাম্যের অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে **'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য'** অথবা **'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার'** থেকে বঞ্চিত করবে না। 'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকারটি' মার্কিন সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি **সুব্বা রাও**-এর মতে, **প্রথমটি নেতিবাচক এবং দ্বিতীয়টি ইতিবাচক**। প্রথমটিতে বিশেষ সুযোগসুবিধার অনুপস্থিতি এবং দ্বিতীয়টিতে আইনের সমান আচরণের কথা বলা হয়েছে।

'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' এই নীতিটি ব্রিটেনের প্রথাগত আইন এবং ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের দ্বিতীয় নীতির অনুকরণে রচিত। ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের দ্বিতীয় অনুমান হল, কোনো ব্যক্তিই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে একজন দরিদ্র নাগরিক পর্যন্ত সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান। পদ বা সামাজিক মর্যাদা যাই হোক না কেন আইনের চোখে কোনো ব্যক্তিই বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারবে না।

সংবিধানে 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' নীতির কতকগুলি **ব্যতিক্রমের** কথা বলা হয়েছে, যথা :

১। রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপালগণ নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন দায়িত্ব পালনের জন্য যে কাজ করবেন, তার জন্য তাঁরা কোনো আদালতের কাছে দায়বদ্ধ নন।

২। স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায় না।

৩। এমনকি স্বপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বা পরে সম্পাদিত ব্যক্তিগত কার্যাবলির জন্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালগণের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা রুজু করতে দুই মাসের নোটিশ দিতে হয়।

৪। বিদেশি রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ ভারতে অবস্থানকালে কোনো অপরাধ করলে ভারতীয় আদালত তার বিচার করতে পারবে না।

৫। কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ আদালতের পরিবর্তে শাসনবিভাগীয় বিশেষ আদালতে বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ভাড়া নিয়ন্ত্রণ ও শিল্প আদালতের কথা বলা যায়। আবার সৈন্যবাহিনীর সদস্যদের বিচারের জন্য সামরিক ট্রাইব্যুনাল আছে।

৬। যুদ্ধকালীন সময়ে শত্রুপক্ষের ব্যক্তিরা আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন না বা অন্যান্য বন্দিদের মতো সুযোগসুবিধাও পান না।

আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার বলতে বোঝায় সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আইন সমভাবে প্রযুক্ত হবে এবং রাষ্ট্র কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এর দ্বারা আরও বোঝানো হয়েছে যে, একই অবস্থার মধ্যে নাগরিকগণ একই ধরনের সুযোগসুবিধা ভোগ করবেন। অবশ্য রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে **যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিভাজনের** ব্যবস্থা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অ-সামরিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মাদক দ্রব্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করলেও সামরিক ব্যক্তিদের জন্য এটি অনুমোদন করতে পারে। তবে এই

Scanned with CamScanner

শ্রেণিবিভাজনের ভিত্তি যথার্থ ও সুস্পষ্ট হবে। কোনো আইন যদি সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে, সেক্ষেত্রে আদালত সেই আইনটিকে বাতিল করে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বনাম আনোয়ার আলি মামলায় সুপ্রিমকোর্ট 'পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ আদালত আইন ১৯৫০'-এর ৫(১) নং ধারাটিকে বাতিল করে দেয়, কারণ উক্ত ধারা বলে সমান অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা সম্ভব ছিল।

'যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিভাজনের ভিত্তি' হিসাবে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে গ্রহণ করা হয় ঃ

প্রথমত, আয়ের (income) **ভিত্তিতে** শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে। সরকার ব্যক্তিগত আয়ের ওপর কর ধার্য করতে পারে। কিন্তু যাঁরাই আয় করেন তাঁদেরকেই কর দিতে হয় না। আবার যাঁদের ওপর কর ধার্য করা হয় তাঁদের সকলকে সমহারে কর দিতে হয় না। সরকার আয়ের পরিমাণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন করের হার নির্ধারণ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সময়ের (time) **ভিত্তিতেও** অনেক সময় শ্রেণিবিভাগ করা হয়। সরকার কোনো কর-হারের পুনর্বিন্যাস করলেও, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বকেয়া কর পুরাতন হারে সংগ্রহের নির্দেশ দিতে পারে।

তৃতীয়ত, কখনো-কখনো ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক (territorial) **ভিত্তিতে** শ্রেণিবিভাগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ সরকার মাত্র কয়েকটি জেলায় জুরির বিচার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

১৫ নং ধারা ঃ সাম্যের অধিকারকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১৪নং অনুচ্ছেদ ছাড়া সংবিধানে আরও কয়েকটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে। **১৫(১) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।** আবার এই সমস্ত কারণের জন্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ বা প্রমোদস্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে অথবা রাষ্ট্রীয় অর্থে পরিচালিত কূপ, জলাশয়, স্নানের ঘাট, পথ বা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে কোনো নাগরিকের প্রবেশের ওপর কোনো শর্ত বা বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে না [১৫(২)]। তবে সংবিধানের ১৫(৩) এবং (৪) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, স্ত্রীলোক, শিশু, শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, সেইসব ব্যবস্থা সাম্য নীতির বিরোধী বলে বিবেচিত হবে না।

১৬ নং ধারা ঃ সংবিধানের ১৬নং ধারা অনুসারে জাতি, ধর্ম, বংশ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্যের জন্য কোনো নাগরিক **সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগের** ব্যাপারে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না কিংবা তার প্রতি কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। নিয়োগ ছাড়াও বেতন, পদোন্নতি, ছুটি, পেনশন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এই নিয়ম কার্যকরী হবে। অবশ্য এই নিয়মের কিছু **ব্যতিক্রম** আছে। উদাহরণস্বরূপ (১) রাষ্ট্র সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বসবাসগত শর্ত আরোপ করতে পারে, (২) অনুন্নত শ্রেণির নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র সরকারি পদ বা চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে, (৩) রাষ্ট্র তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ব্যক্তিদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে পারে।

১৭ নং ধারা ঃ সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে **'অস্পৃশ্যতা'র বিলোপ সাধন করা হয়েছে** এবং অস্পৃশ্যতার আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে পার্লামেন্ট অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত অপরাধ আইন পাশ করে অস্পৃশ্যতা আচরণের জন্য প্রয়োজনীয় দণ্ডদানের ব্যবস্থা করেছে। এই আইন অনুসারে কোনো ব্যক্তিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রভৃতিতে অথবা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত প্রমোদস্থান, দেবালয়, দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা অপরাধ বলে গণ্য হবে। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজব্যবস্থা 'অস্পৃশ্যতা' নামক অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়নি। আজও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হরিজন হত্যা বা নিগ্রহের ঘটনা ঘটে। এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান করতে গেলে সমাজব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর দরকার।

১৮ নং ধারা ঃ সংবিধানের ১৮নং ধারায় সামরিক কিংবা শিক্ষা বিষয়ক উপাধি ছাড়া অন্য কোনো **উপাধি প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।** রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া কোনো ভারতীয় নাগরিক বিদেশি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করতে পারবে না। ভারত সরকারের কাজে নিযুক্ত বিদেশিগণও রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া অপর রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো উপাধি গ্রহণ করতে পারবে না। এছাড়া ভারত সরকারের লাভজনক কোনো পদে আসীন ব্যক্তি

Scanned with CamScanner

রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো উপঢৌকন, বেতন বা পদ গ্রহণ করতে পারবে না। অবশ্য ১৯৫৪ সাল থেকে ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান দানের জন্য ভারত সরকার ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী প্রভৃতি উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করে। **সমালোচকদের মতে, এইসব উপাধি জনসাধারণের মধ্যে কৃত্রিম বৈষম্যের সৃষ্টি করে, তাই এই ব্যবস্থা সাম্য নীতির পরিপন্থী।**

উপসংহার : ভারতীয় সংবিধানে সাম্যের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দান গণতন্ত্রের পথে একটি সুদৃঢ় পদক্ষেপ সন্দেহ নেই, কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে ১৪ থেকে ১৮নং ধারাগুলিতে যেসব সাম্যের অধিকারের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রকৃতির। **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের বিষয়টি পুরোপুরি অবহেলিত থেকে গেছে।** অথচ আসল সত্যটা হল এই যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক, আইনগত ও সামাজিক অধিকার প্রহসনে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল মানুষ রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমানাধিকারের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। "ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন" (নজরুল ইসলাম)। তাছাড়া আইনানুগ সমতাকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য সংবিধানে কোনো ব্যবস্থা নেই। আসলে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা যেহেতু উদারনৈতিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই সাম্যের অধিকারটিকে উদারনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তোলা হয়েছে।

৪.৫ ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত স্বাধীনতার অধিকার
Right to freedom as guaranteed in the constitution of India

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে স্বাধীনতার অধিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার এবং এই অধিকারটি গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য। সংবিধানের ১৯ থেকে ২২নং অনুচ্ছেদগুলিতে এই অধিকারটি বর্ণিত হয়েছে।

মূল সংবিধানের ১৯নং অনুচ্ছেদে **সাত প্রকার** স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ ছিল। ১৯৭৮ সালে সংবিধানের ৪৪ তম সংশোধন দ্বারা সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় থেকে বাদ দেওয়ার ফলে স্বাধীনতার অধিকারগুলির সংখ্যা হ্রাস পেয়ে **ছয়টিতে** এসে দাঁড়িয়েছে, যথা—(১) বাক্ ও মতামত প্রকাশের অধিকার ; (২) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার ; (৩) সংঘ বা সমিতি কিংবা সমবায় সমিতি গঠন করার অধিকার ; (৪) ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে যাতায়াত করার অধিকার ; (৫) ভারতের যে-কোনো স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপনের অধিকার ; (৬) যে-কোনো উপজীবিকা বা ব্যাবসাবাণিজ্য চালাবার অধিকার।

১৯নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপরিউক্ত অধিকারগুলি ব্যক্তির সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য।

কিন্তু উপরিউক্ত ছয় প্রকার অধিকার **অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত নয়।** অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫১) বিচারপতি বিজন কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "কোনো দেশই অবাধ স্বাধীনতা দিতে পারে না ; কারণ তার ফলে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা এবং বিপদ দেখা দিতে পারে।" ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য রচনা করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধানে স্বাধীনতার অধিকারগুলির ওপর **যুক্তিসংগত বাধানিষেধ** আরোপ করার কথা বলা হয়েছে।

বাক্ ও মতামত প্রকাশের অধিকারের ওপর যে-সকল কারণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেতে পারে সেগুলি হল—ভারতের সার্বভৌমিকতা ও অখণ্ডতা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন সংরক্ষণ, জনশৃঙ্খলা, শ্লীলতা বা সদাচার রক্ষা, আদালত অবমাননা, মানহানি ও কোনো অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা দান ইত্যাদি।

সমবেত হওয়ার অধিকারের সঙ্গেই উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যে, এরূপ সমাবেশ শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র হওয়া আবশ্যক। ভারতের সার্বভৌমিকতা, অখণ্ডতা এবং জনশৃঙ্খলার স্বার্থে এই অধিকারটির ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।

সংঘ বা সমিতি কিংবা সমবায় সমিতি গঠনের অধিকারের ওপর ভারতের সার্বভৌমিকতা ও অখণ্ডতা জনশৃঙ্খলা বা নৈতিকতার কারণে বাধানিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। নাগরিকগণ কোনো অপরাধ অনুষ্ঠানের

Scanned with CamScanner

জন্য মিলিত হলে বা জনশান্তি নষ্ট করে সমিতি গঠন বা ইউনিয়ন করলে বা অবৈধভাবে ধর্মঘট করলে তা নিষিদ্ধ করা যাবে।

স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার এবং ভারতের যে-কোনো স্থানে বসবাসের অধিকার জনস্বার্থে বা তপশিলি উপজাতিদের স্বার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

যে-কোনো বৃত্তি, পেশা বা ব্যবসাবাণিজ্যে অংশগ্রহণের যে অধিকারগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকেও রাষ্ট্র জনস্বার্থে সীমাবদ্ধ করতে পারে। রাষ্ট্র বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশা অবলম্বনের ক্ষেত্রে আবশ্যিক যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে পারে। তাছাড়া জনস্বার্থে রাষ্ট্র যে-কোনো ব্যাবসাবাণিজ্য, বা শিল্পকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সংবিধানের ১৯নং ধারায় নাগরিকদের যেমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার প্রদান করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এইসব অধিকারের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এইভাবে **ভারতীয় সংবিধানে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।**

তবে রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত নিয়ন্ত্রণ বা বাধানিষেধগুলিকে **'যুক্তিসংগত'** (reasonable) হতে হবে। বাধানিষেধগুলি যুক্তিসংগত কিনা তা বিচারের ক্ষমতা সংবিধান আদালতের ওপর ন্যস্ত করেছে। আইন কর্তৃক আরোপিত কোনো বাধানিষেধ যুক্তিসংগত হয়নি মনে করলে আদালত সেই আইন বা তার অংশবিশেষকে সংবিধান-বিরোধী বলে বাতিল করে দিতে পারে। কোনো বাধানিষেধ তখনই যুক্তিসংগত হবে যখন তা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে যথার্থ সামঞ্জস্য বিধান বা ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

সমালোচকদের মতে, (i) সংবিধানের ১৯ (২-৬) নং উপধারাগুলিতে স্বাধীনতার অধিকারের ওপর যেসব বিধিনিষেধের কথা বলা হয়েছে, তাতে জনগণের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। **(ii)** এছাড়া জনস্বার্থ, জনশৃঙ্খলা, অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনাদান প্রভৃতি ধারণাগুলি এতই অস্পষ্ট এবং ব্যাপকভাবে অর্থবহ যে, রাষ্ট্র এসবের অজুহাতে যখনতখন অপ্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। **(iii)** কোনো আইন কর্তৃক আরোপিত বাধানিষেধ যুক্তিসংগত হয়নি বলে আদালত সংশ্লিষ্ট আইনকে বাতিল করে দিতে পারলেও, আইনবিভাগ আদালতের রায়কে অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনমতো সংবিধান সংশোধন করে নিতে পারে। বস্তুতপক্ষে আইনবিভাগ এইভাবে বহুক্ষেত্রে আদালতের রায়কে অতিক্রম করেছে। এই প্রসঙ্গে সংবিধানের প্রথম, চতুর্থ, ষোড়শ, চতুর্বিংশ ও বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনী আইনের উল্লেখ করা যেতে পারে। **(iv)** সংবিধানের ২৫তম সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে ১৯নং ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির ওপর স্থান দেওয়া হয়েছে। **(v)** সবশেষে, জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে ১৯নং ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলি স্থগিত রাখা যায় এবং এ ব্যাপারে আদালতের কিছু করার নেই।

১৯নং ধারায় ছয় দফা অধিকার ছাড়াও সংবিধানের ২০, ২১ এবং ২২নং ধারায় আরও কতকগুলি স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে।

২০নং ধারায় অপরাধ এবং অপরাধী সংক্রান্ত তিনটি অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে। **প্রথমত,** যে সময়ে অপরাধ করা হয়, সেই সময়ের প্রচলিত আইন অনুসারে যে শাস্তি দেওয়া যায়, তার অধিক শাস্তি অপরাধীকে দেওয়া যাবে না [২০ (১) নং ধারা]। **দ্বিতীয়ত,** একজন ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না [২০ (২) নং ধারা]। **তৃতীয়ত,** কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না [২০ (৩) নং ধারা]। সংবিধানে উল্লিখিত এই অধিকারগুলির উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে যথেচ্ছ এবং অতিরিক্ত শাস্তি প্রদানের হাত থেকে রক্ষা করা।

সংবিধানের **২১নং ধারায়** বলা হয়েছে যে, **'আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি'** (Procedure established by law) ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। 'আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি' কথাটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে আদালত বিচার করে দেখবে, যে পদ্ধতিতে এটা করা হয়েছে তা বৈধ কিনা। ভারতীয় বিচারবিভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় কোনো আইনের

Scanned with CamScanner

যৌক্তিকতা বিচার করতে পারবে না। সমালোচকদের মতে, 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' (Due process of law)-এই কথাটির পরিবর্তে 'আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি' (Procedure established by law)-কথাটি ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাগণ ভারতের বিচারবিভাগকে দুর্বল করে তুলেছেন।

২০০২ সালে প্রণীত ৮৬তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে **২১ (ক) নং ধারাটি** সংযুক্ত হয়েছে এবং **শিক্ষার অধিকারকে** মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে, ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক সকল ছেলেমেয়ের জন্য অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র। এরপর ২০১০ সালে পার্লামেন্ট শিক্ষার অধিকার আইন (Right to Education Act, 2010) প্রণয়ন করে এবং ওই বছরের এপ্রিল মাস থেকে এই আইনটিকে কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেয়।

ভারতীয় সংবিধানের **২২নং ধারায়** স্বাধীনতার অধিকারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে **অবৈধ গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে সংরক্ষণের অধিকার**। এই ধারা অনুসারে (ক) কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক করার পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে। (খ) আটক ব্যক্তিকে নিজ পছন্দ মতো আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করার এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ওই আইনজীবীকে নিযুক্ত করার অধিকার দিতে হবে। (গ) গ্রেপ্তার করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আটক ব্যক্তিকে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া তাকে উক্ত সময়ের বেশি আটক রাখা যাবে না। তবে এইসব সুযোগসুবিধা **শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি এবং নিবর্তনমূলক আটক আইনে** ধৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না। নিবর্তনমূলক আটক আইন অনুসারে কোনো ব্যক্তিকে তিন মাস পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক রাখা যেতে পারে।

বিনা বিচারে আটক সম্পর্কিত এই বিধিটি নিঃসন্দেহে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের কলঙ্কস্বরূপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শুধু সংকটকালীন অবস্থায় এরূপ আইন প্রয়োগ করা যায় ; কিন্তু ভারতবর্ষে স্বাভাবিক অবস্থাতেও এই আইন কার্যকর করা যায়।

মূল্যায়ন ঃ ভারতীয় সংবিধানের ১৯ থেকে ২২ নং ধারাগুলিতে যেসব স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সমালোচকেরা এই ব্যাপারে কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন ঃ

প্রথমত, রাষ্ট্রের হাতে স্বাধীনতার অধিকারগুলিকে নিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, ক্ষমতাসীন দলীয় সরকার সেই ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটিয়ে নাগরিকের স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন—ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা এই সত্যটিকে অবহেলা করেছেন।

তৃতীয়ত, 'নিবর্তনমূলক আটক' ব্যবস্থাকে সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী বলে সমালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থত, শিক্ষার অধিকার নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অধিকার। তবে সমালোচকদের মতে, শুধু মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি পেলেই এই অধিকারটি ফলপ্রসূ হবে এমন কোনো কথা নেই। পশ্চিমবঙ্গে বহু আগে থেকেই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্যের সকল ছেলেমেয়েকে শিক্ষার আলোয় আনা যায়নি। এই অধিকারটি কার্যকর করার আগে সকলের জন্য ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে হবে।

সবশেষে বলা যায়, সংবিধানে বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারটির অনেক সীমাবদ্ধতা আছে সত্য, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে এই অধিকারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned with CamScanner

৪.৭ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার
The Right Against Exploitation

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো শত্রু হল শোষণ। কারণ এই শোষণ থেকেই আসে বৈষম্য যা গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায়। তাই ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা সংবিধানের ২৩ ও ২৪ নং ধারা দুটির মাধ্যমে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সংবিধানের ২৩ (১) নং অনুচ্ছেদে মানুষ ক্রয়-বিক্রয়, বেগার খাটানো, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে শ্রমদানে বাধ্য করানো দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ২৩ (২) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে রাষ্ট্র জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও শ্রেণি নির্বিশেষে সকলকে শ্রমদানে বাধ্য করতে পারে।

সংবিধানের ২৪নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের কোনো কারখানা, খনি বা অন্য

Scanned with CamScanner

কোনো বিপজ্জনক কার্যে নিযুক্ত করা যাবে না। এই অনুচ্ছেদটি নির্দেশমূলক নীতির অধ্যায়ে বর্ণিত ৩৯নং ধারাটির অনুরূপ। এই অধিকারটিকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট 'কারখানা সংক্রান্ত আইন' (১৯৪৮), 'খনি সংক্রান্ত আইন' (১৯৫২), 'শিশুশ্রমিক(নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন' (১৯৮৬) প্রভৃতি আইন প্রণয়ন করেছে।

অবশ্য সংবিধানের নির্দেশ থাকলেই যে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে সেকথা ভাবা ঠিক নয়। তার প্রমাণ সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার ৬৬ বছর পরেও দেশে আজ অসংখ্য ভূমিদাস রয়েছে, ৫ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ভারতে এখন ১ কোটি ৬০ লক্ষ শিশুশ্রমিক রয়েছে। সুতরাং, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সংবিধানের ঘোষণাই যথেষ্ট নয়, এর জন্য প্রয়োজন শোষণের মূল কারণটিকে (সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা) উচ্ছেদ করা।

৪.৮ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার
Right to Freedom of Religion

ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতৃবর্গ ভারতবর্ষকে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত না করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার **অনন্তশায়ানাম আয়েঙ্গার** (A. Ayyangar)-এর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, 'আমরা ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ" ("We are pledged to make the state a secular one.")

আভিধানিক অর্থে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলতে এমন একটি আদর্শকে বোঝায়, যা মনে করে সমাজের নীতিবোধ তৈরি হবে মানুষের ইহজগতের ভালোমন্দের বিচারে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। এটি এমন একটি আদর্শ যা ঈশ্বরকে নয়, মানুষকে সমস্ত জাগতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে, যা ধর্মকে শিক্ষা ও রাজনীতি থেকে আলাদা করে। কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়। এখানে ধর্মনিরপেক্ষ বলতে সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা দেওয়াকে বোঝানো হয়। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **আয়েঙ্গার** গণপরিষদে বলেন, "ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে আমরা একথা বলতে চাইছি না যে, কোনো ধর্মের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই এবং আমাদের জীবনের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্মনিরপেক্ষ কথাটির অর্থ হল, রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতা করবে না এবং এক ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আভিধানিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি ভারতে ব্যবহার হয় না। বাস্তবিকপক্ষে ভারতে ধর্মকে পুরোপুরি ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখা হয় না এবং রাজনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি থেকে ধর্মকে আলাদা করা হয় না।

ভারতীয় সংবিধানের **২৫, ২৬, ২৭** এবং **২৮ নং** এই চারটি ধারাতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্বন্ধে যে বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে তার মাধ্যমেই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংবিধানের **২৫ নং ধারায়** বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মগ্রহণ, ধর্মপালন ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে। এই অধিকারটি অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত নয়। জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, জনস্বাস্থ্য ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের স্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারটির ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। এছাড়া, রাষ্ট্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক কিংবা অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে [২৫(২)(ক) ধারা]। আবার সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে অথবা হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সকল শ্রেণির হিন্দুদের কাছে উন্মুক্ত রাখার জন্যও রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে [২৫(২)(খ) ধারা]। সংবিধানে 'হিন্দু' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। হিন্দু বলতে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরও বোঝানো হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১)(খ) নং ধারায় নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার কথা বলা হলেও শিখ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কৃপাণ ধারণ ও বহন করতে পারবে।

সংবিধানের ২৫নং ধারায় উল্লিখিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্মাচরণের অধিকার **শর্তহীনভাবে ভোগ করা যায় না** এবং তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। ধর্মের নামে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিঘ্নিত হলে, কিংবা নরবলির মতো অমানবিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হলে, অথবা দেবদাসী, সতীদাহ প্রথার

Scanned with CamScanner

মতো নীতিবিগর্হিত আচার অনুষ্ঠান চলতে থাকলে সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। সুতরাং, এগুলি বন্ধ হওয়া দরকার।

২৬নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় (Religious denomination) (১) ধর্ম ও দানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার, (২) নিজ নিজ ধর্মবিষয়ক কার্যাবলি পরিচালনা করার, (৩) স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করার এবং (৪) আইনানুসারে এই সম্পত্তি পরিচালনা করার অধিকার ভোগ করবে। এই অধিকারগুলিকে রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা, নীতিবোধ ও জনস্বাস্থ্যের কারণে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

২৭নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায়ের উন্নতি অথবা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো প্রকার কর প্রদান করতে বাধ্য করা যাবে না। তবে মন্দির দর্শন, বিগ্রহ দর্শন, পূজা ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তি বা অনুদান ধার্য করা যায়, যা কার্যত করধার্যেরই বিকল্প ব্যবস্থা বলা যায়।

২৮ নং ধারায় বলা হয়েছে, সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থ দ্বারা পরিচালিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং ধর্মমূলক উপাসনায় যোগদান করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। আবার, যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কিংবা সরকারি অর্থে আংশিকভাবে পরিচালিত, সেগুলিতেও শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাবে না। তবে রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু কোনো দাতা বা অছির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে, যদি দাতার উইলে কোনো বিশেষ ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ থাকে।

২৫ থেকে ২৮ নং ধারাগুলি ছাড়াও ভারতীয় সংবিধানের অন্যান্য অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ধর্মীয় অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, সংবিধানের প্রস্তাবনায় মত প্রকাশের, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। **১৫ ও ১৬ নং** ধারায় ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শ্রেণিবিভাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। **১৭ নং** ধারায় অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন করা হয়েছে। সংবিধানের **২৯(২)নং** ধারায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে এবং **৩২৫ নং** ধারায় ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে যে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, স্বাধীন ভারতে তা বাতিল করা হয়েছে। সংবিধানের **২৯ নং** ধারায় সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া সংবিধানের **৪৪ নং** ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষেত্রে একই প্রকার দেওয়ানি আইন প্রযোজ্য হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এগুলি সবই ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক উপাদান।

কিন্তু ভারতবর্ষে যে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ চালু রয়েছে, পশ্চিমি দেশগুলিতে সেরূপ দেখা যায় না। বিভিন্ন ধর্মকে রক্ষা করা বা তার সমন্বয় ঘটানো ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি নয়। সমাজ ও রাজনীতির ওপর ধর্মের পরম্পরাগত প্রভাবকে দুর্বল করাই ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্য হওয়া উচিত। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ রাষ্ট্রপরিচালনা, শিক্ষানীতি, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি থেকে ধর্মকে আলাদা রাখা।

দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে তা হচ্ছে না। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকছে না, ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখা হচ্ছে না। হিন্দু মৌলবাদীদের খুশি করার জন্য রাম মন্দিরের শিলান্যাস করা হয়েছে, আবার মুসলমান মৌলবাদকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মুসলিম শরিয়তি আইন পাশ করা হয়েছে। ধর্মীয় আবেগ ও সাম্প্রদায়িক প্রচারে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। এর ফলে সাম্প্রদায়িকতা বারবার মাথাচাড়া দিচ্ছে। এরই ফলে ভারতের সযত্ন লালিত ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র আজ আক্রান্ত।

৪.৯ সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার
Cultural and Educational Right

জনগণ যাতে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে না থেকে সুস্থ নাগরিক চেতনার অধিকারী হয় সেই উদ্দেশ্যে সংবিধানের ২৯ এবং ৩০ নং অনুচ্ছেদে সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। **২৯ (১) নং ধারা** অনুসারে ভারতীয় ভূখণ্ডে বা তার কোনো অংশে বসবাসকারী নাগরিকরা নিজ নিজ ভাষা, লিপি এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকার ভোগ করবে। **২৯ (২) নং ধারায়** বলা হয়েছে যে, সরকারের দ্বারা বা সরকারের আর্থিক সাহায্যে

Scanned with CamScanner

পরিচালিত কোনো শিক্ষায়তনে ধর্ম, বংশ, বর্ণ, ভাষা বা তার কোনো একটির ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

সংবিধানের **৩০নং ধারা** অনুসারে ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘু সহ সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিই নিজ পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারবে। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত, কেবল এই কারণে সরকারি সাহায্যের ব্যাপারে এদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না [৩০(২)]।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের প্রয়োজন ও পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ তো পাবেই, কোনো কারণে রাষ্ট্র তাদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করলে রাষ্ট্র পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। এছাড়া, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য ও স্বীকৃতিদানের সময়ে সরকার শিক্ষকের যোগ্যতা, শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর যুক্তিসংগত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকারটি ভারতের মতো বহু ভাষাভাষী ও বহু সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, তবে এই অধিকারটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হলে দরকার একটি সুস্থ অনুকূল পরিবেশ। মনে রাখতে হবে, সংবিধানের ৩০ নং অনুচ্ছেদে যে শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকার প্রদান করা হয়েছে তা কেবল ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্য কোনো সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে নয়।

৪.১০ শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার
Right to Constitutional Remedy

শাসনতন্ত্রে কতকগুলি মৌলিক অধিকারকে লিপিবদ্ধ করাই যথেষ্ট নয়, এগুলি যাতে কার্যকর হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। **দুর্গাদাস বসুর** মতে, "Abstract declarations of fundamental rights in the constitution are useless, unless there is the means to make them effective." ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে ভারতীয় সংবিধানের ৩২ এবং ২২৬ নং ধারা দুটিতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য 'শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার' লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

মৌলিক অধিকার কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ হলে নাগরিকগণ সংবিধানের ৩২ নং ধারা অনুসারে সুপ্রিমকোর্টের কাছে এবং ২২৬ নং ধারা অনুসারে হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে। সুপ্রিমকোর্ট এবং হাইকোর্ট মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করার উদ্দেশ্যে ৫ ধরনের আদেশ বা নির্দেশ বা লেখ (Writ) জারি করতে পারে, যথা—(১) বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, (২) পরমাদেশ, (৩) প্রতিষেধ, (৪) অধিকার পৃচ্ছা এবং (৫) উৎপ্রেষণ।

১. **বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ** (Haveas Corpus) ঃ বন্দি প্রত্যক্ষীকরণের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Habeas Corpus' একটি লাতিন শব্দ, যার অর্থ হল **'সশরীরে হাজির করা'**। কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হলে উক্ত আটক ব্যক্তি বা তার পক্ষে কেউ আদালতের কাছে বন্দি প্রত্যক্ষীকরণের আবেদন করতে পারে। আদালত এই আবেদনের ভিত্তিতে আটক ব্যক্তিকে ও আটককারী কর্তৃপক্ষকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়। আটক বেআইনিভাবে হয়েছে বলে মনে করলে আদালত আটক ব্যক্তিকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিতে পারে।

২. **পরমাদেশ** (Mandamus) ঃ পরমাদেশ শব্দটির অর্থ হল **'আমরা আদেশ করি'**। পরমাদেশ জারি করে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা অধস্তন আদালত বা সরকারকে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দিতে পারে। তবে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পরমাদেশ জারি করার ক্ষমতা আদালতের নেই।

৩. **প্রতিষেধ** (Prohibition) ঃ প্রতিষেধ শব্দের অর্থ হল **'নিষেধ করা'**। এই আদেশের মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট কোনো অধস্তন আদালতকে নিজ সীমার মধ্যে কাজ করতে নির্দেশ দিতে পারে। এই লেখ কেবল আদালতের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা যায়।

৪. **অধিকার পৃচ্ছা** (Quo-warranto) ঃ এই লেখটির অর্থ হল **'কোন্ অধিকারে'**। এই লেখ বা নির্দেশের

Scanned with CamScanner

সাহায্যে আদালত অনুসন্ধান করে দেখে যে, কোনো ব্যক্তিকে যে পদে নিয়োগ করা হয়েছে সে সেই পদের উপযুক্ত কিনা। উপযুক্ত না হলে আদালত সংশ্লিষ্ট নিয়োগকে বাতিল করে দিতে পারে।

৫. **উৎপ্রেষণ** (Certiorari) ঃ এটির অর্থ **'বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া'**। নিম্নতন কোনো আদালত যদি তার আইনগত সীমা অতিক্রম করে, তাহলে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট উৎপ্রেষণ লেখ জারি করে মামলাটি নিজের কাছে তুলে নিয়ে আসতে পারে। দেশের পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও এরূপ আদেশ প্রয়োগ করা যায়।

এই শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটি অন্যান্য মৌলিক অধিকারের মতো **অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত** নয়।

প্রথমত, সংবিধানের ৩৫৯ নং ধারা অনুসারে, জরুরি অবস্থার ঘোষণা কার্যকর থাকাকালীন রাষ্ট্রপতি আদেশ প্রদান করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য আদালতে আবেদন করার অধিকারকে স্থগিত করে রাখতে পারেন। জরুরি অবস্থা চলাকালীন কোনো মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করা হলে এর প্রতিকারের জন্য আদালতের আশ্রয় নেওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, সংবিধানে বলা হয়েছে, সামরিক বাহিনীর লোকেরা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত কর্মীরা কী কী মৌলিক অধিকার ভোগ করবেন তা পার্লামেন্ট আইন করে স্থির করে দেবে।

তৃতীয়ত, ভারতের কোনো অঞ্চলে যখন সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়, তখন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে নিযুক্ত কোনো সরকারি কর্মচারী কোনো অবৈধ কাজ করলে, পার্লামেন্ট দণ্ডনিষ্কৃতি আইন (Indemnity Act) পাশ করে উক্ত কার্যকে বৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে।

এতসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও **এই অধিকারটির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না**। এই অধিকারটি না থাকলে অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলি শাসনবিভাগ তথা আইনবিভাগের অহরহ আক্রমণে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ত। শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটির গুরুত্ব প্রসঙ্গে **ড. আম্বেদকর** গণপরিষদে মন্তব্য করেন, "আমাকে যদি সংবিধানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি ধারার নাম করতে হয়, যে ধারাটি বাদ দিলে এই সংবিধান অর্থহীন হয়ে পড়বে, আমি তাহলে এই ৩২ নং ধারাটি ছাড়া অন্য কোনো ধারার উল্লেখ করব না।" তিনি এই ধারাটিকে ভারতীয় সংবিধানের **আত্মা এবং প্রাণ** (the very soul of the constitution and the heart of it) বলে বর্ণনা করেন।

Scanned with CamScanner